লিপিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লিপিকা

পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়া-ঘাটের পাশে বটগাছ-তলায়; তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে; তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে, কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেচে জানি নে।

এই পথে কত মানুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারও বা ঘোমটা আছে, কারও বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলবার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

নেবুতলা উজিয়ে, সেই পুকুরপাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে, সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, 'এই-যে!'

এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম; দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে।

৩

'ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধুলোয় কান পেতে আছি, আমাকে কানে-কানে বলো।'

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চুপ ক'রে থাকে।

'ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ভাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়!'

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

'ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বুকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই?'

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর স্তব্ধ গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোয় অনির্বাণ বেদনার দেয়ালি-উৎসব।

আশ্বিন ১৩২৬

মেঘলা দিনে

রোজই থাকে সমস্ত দিন কাজ, আর চার দিকে লোক-জন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একে-বারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথাটি যে বাকি রয়ে গেল, তা বুঝে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকাল বেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মানুষ সমুদ্র পার হল, পর্বত ডিঙিয়ে গেল, পাতাল-পুরীতে সিঁধ কেটে মণি-মানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা— এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মানুষ বলছে, 'আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের শ্রাবণমেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!'

আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনতে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, 'কী করি! কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে! কে আছে যার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জ্বলে উঠবে! আমার কাছে ঠিক সুরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে, আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বনেশে ভিখারি রাস্তার কোন্ মোড়ে!'

আমার ভিতর-মহলের ব্যথা আজ গেরুয়াবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কাজের বাহিরের পথে— যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারার মতো, কোন্ মনের মানুষের চলায় চলায় বাজছে!

আশ্বিন ১৩২৬

বাণী

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে— মাটির কাছে ধরা দেবে ব'লে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের জন্য অল্প জায়গার জগৎ, অল্প মানুষের। ওইটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই— আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু, কোন্ দেবতার কৌতুকহাস্যের মতো অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ওই ছোটো মেয়েটির জন্ম! মা তাকে রেগে বলে 'দস্যি', বাপ তাকে হেসে বলে 'পাগলি'।

সে পলাতকা ঝর্নার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেণুবনের উপর-ডালের পাতা, কেবলই ঝির্ ঝির্ করে কাঁপছে।

২

আজ দেখি সেই দুরন্ত মেয়েটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে— বাদল-শেষের ইন্দ্রধনুটি

বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন স্তব্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।

৩

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ; গাছের পাতাগুলো শুকনো হলদে, হতাশ্বাস।

এমন সময় হঠাৎ কালো আলুথালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেললে। সূর্যাস্তের একটা রক্তরশ্মি খাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

অর্ধেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়্ খড়্ শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর গির্জের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালবেলায় জলের ধারা আরও ঘনিয়ে এল—রৌদ্র আর উঠল না।

৪

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বললে, 'মা ডাকছে।' সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বেণী উঠল দুলে। কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধ'রে টানলে; সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্যে টানাটানি করতে লাগল; তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

৫

বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদিযুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে সেই স্মরণ-বিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলস্বরে ওই মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবলীলা! সেই সুদূর— সেই বিরাট আজ এই দুরন্ত মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড়ো বড়ো চোখ মেলে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইল, যেন অনন্তকালেরই প্রতিমা।

ভাদ্র ১৩২৬

মিলনের প্রথম দিনে বাঁশি কী বলেছিল ?

সে বলেছিল, 'সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দূরের।'

আর বাঁশি বলেছিল, 'ধরলেও যাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।'

তার পরে রোজ বাঁশি বাজে না কেন ?

কেননা, আধখানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে; কিন্তু, সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আধখানায় মিলন সেইটেই দেখি, যে আধখানায় বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না; কাছের পর্দা আড়াল করেছে।

দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চুপকে বাঁশির সুর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতিদিনের কাজে কর্মে কথায় ভ'রে গিয়েছে, প্রতিদিনের ভয় ভাবনা কৃপণতায়।

২

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে হাওয়া দেয়, বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে, মনে পড়ে এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন ক'রে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ?

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে? সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন, তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নূতন ক'রে খুঁজে-পাই কোন্ কূলহারা কামনার ধারে?

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে?

৩

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীয় উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার সুদূর দুর্গম নির্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজান পথ বেয়ে বাঁশির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে, আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেল-বনের মর্মরমুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা ক'রে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌঁছিয়ে দিক যেখানে সে তার এলোচুলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাজে ব্যস্ত।

৪

বহুদূরের অসীম আকাশ/আজ/বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, 'আমি তোমারই।'

পৃথিবী বললে, 'সে কেমন ক'রে হবে! তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।'

আকাশ বললে, 'আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।'

পৃথিবী বললে, 'তোমার যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।'

আকাশ বললে, 'আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।'

পৃথিবী বললে, 'আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।'

আকাশ বললে, 'আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি? আমার বক্ষ আজ শ্যামল হল তোমার ঐ শ্যামল হৃদয়টির মতো।'

সে এই ব'লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চির-বিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

৫

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুঞ্জন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের 'পরে। প্রিয়ার মধ্যে যা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজে-ওঠা বীণার তারের মতো চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনান্তের রঙটির মতো তার নীলাঞ্চল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আর্ত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেণীর বাঁকে বাঁকে জড়িয়ে উঠে।

যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার থর্‌-থর্‌ করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কেঁপে কেঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আসুক, ভিজে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

কার্তিক ১৩২৬

বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা— প্রতিদিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নেমে এল মর্তের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি, আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে? কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতিদিনের সুরের মিল কোথায়? গোপন অতৃপ্তি, গভীর নৈরাশ্য; অবহেলা অপমান অবসাদ; তুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুশ্রী নীরসতার কলহ, ক্ষমাহীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাঁশির দৈববাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথায়?

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই সমস্ত চেনা

কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিন-কার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংশুকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনতলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালা-বদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেম, তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে দুগাছি মল, সে যেন কান্নার সরোবরে আনন্দের পদ্মটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের ভিতর দিয়ে তাকে সংসারের মানুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

কার্তিক ১৩২৬

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল ?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ?

জাগল কে ? নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে ; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি ; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে ; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে 'তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত'। ওদের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারও বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ওই প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

কার্তিক ১৩২৬

পুরোনো বাড়ি

অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ওই বাড়ি।

দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়ছে।

দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুই পাখি ধুলোয় পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডী-মণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল।

উত্তর দিকের এক-পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা— শোকাতুরা বিধবার মতো— বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে, কেউ তাকিয়ে দেখে না।

তিন-মহল বাড়ি। কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ। যেন পঁচাশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি— কেবল একখানিতে একালের চলাচল।

বালি-খসা ইঁট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, আপনাকেও দেখে না, অন্যকেও না।

২

একদিন ভোররাত্রে ওই দিকে মেয়ের গলায় কান্না উঠল। শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শখের যাত্রায় রাধিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে মারা গেল।

ক'দিন মেয়েরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না; ব্যথিত হৃৎপিণ্ডের মতো বাতাসে ধড়াস ধড়াস ক'রে আছাড় খায়।

৩

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল।

দেখি, বারান্দা থেকে লাল-পেড়ে শাড়ি ঝুলছে।

অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে। তার মাইনে অল্প, ছেলেমেয়ে বিস্তর। শ্রান্ত মা বিরক্ত হয়ে তাদের মারে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে।

একটা আধাবয়সি দাসী সমস্ত দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে; বলে 'চললুম', কিন্তু যায় না।

৪

বাড়ির এই ভাগটায় রোজ একটু-আধটু মেরামত চলছে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁখারি বেঁধে দিলে; শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইঁট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে; দেয়ালে চুনকাম হল— কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতা-বাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কৌশলে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই জোড়-ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে— হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।

আশ্বিন ১৩২৬

গলি

আমাদের এই শান-বাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে একদিন কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়— এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাঁকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, 'বলো তো দিদি, তুমি কোন্ নীল শহরের গলি?'

দুপুর বেলায় কেবল একটুখনের জন্যে সে সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, 'কিচ্ছুই বোঝা গেল না।'

বর্ষামেঘের ছায়া দুই-সার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমরু বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে! পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে প'ড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিভূত হয়ে বলে, 'ছিল খট্‌খটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত?'

ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লক্ষ্মীছাড়ার মতো দেখতে হয়; ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, 'এ কোন্ পাগলা দেবতার মাৎলামি!'

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে —মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ইঁদুর —সে জানে, এই সব হচ্ছে বাস্তব। কোনো দিন ভুলেও ভাবে না 'এ সমস্ত কেন'।

অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পুজোর নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, 'এই শান-বাঁধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা-কিছু আছে বা!'

এ দিকে বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে; ঘড়িতে ন'টা বাজে; ঝি কোমরে ঝুড়ি ক'রে বাজার নিয়ে আসে; রান্নার গন্ধে আর ধোঁওয়ায় গলি ভরে যায়; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, 'এই শান-বাঁধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মস্ত একটা-কিছু, সে মস্ত একটা স্বপ্ন।'

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

একটি চাউনি

গাড়িতে ওঠবার সময় একটুখানি মুখ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে?

দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়?

মেঘের সকল সোনার রঙ যে সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়, এই চাউনি কি সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে? নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায়, এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে?

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন— হাজার কথার আবর্জনায়, হাজার বেদনার স্তূপে?

তার ওই এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁছেচে। এ'কে আমি রাখব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে; আমি এ'কে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য, হয়েছে মরবারই জন্যে। কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

গানের সুর বললে, 'আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ওই ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন; ওইগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।'

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুর বেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়ালো। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু ক'রে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুর বেলা।

ইতিহাসে রাজা বাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

অগ্রহায়ণ ১৩২৬

কৃতঘ্ন শোক

ভোর বেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, 'সবই মায়া।'

আমি রাগ করে বললেম, 'এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাদে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাত-পাখাখানি— সবই তো সত্য!'

মন বললে, 'তবু ভেবে দেখো—'

আমি বললেম, 'থামো তুমি। ওই দেখো-না, গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয় সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন?'

মন চুপ করলে। বন্ধু এসে বললেন. 'যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে।'

আমি রাগ করে বললেম, 'কী করে জানলে? দেহ কি ভালো নয়? সে দেহ গেল কোন্‌খানে?'

ছোটো ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, 'সংসার বিশ্বাসঘাতক!'

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল, কে বললে, 'অকৃতজ্ঞ!'

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, 'ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর, আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?'

কার্তিক ১৩২৬

সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি ; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙা-ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায় চামেলি-ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ ; সতেরো বছর ধ'রে এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ওই নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়।—

কিন্তু, এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাখি-বন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না—এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমরা

থাকব কোথায়? আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখবে কে?'

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, 'আমরা খুঁজতে বেরলেম।'

'কাকে?'

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

কার্তিক ১৩২৬

প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল, সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, 'আমাকে চিনতে পারো না?'

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, 'মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।'

সে বললে, 'আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।'

তার চোখের কোণে একটু ছল্‌ছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, 'সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ?'

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলি-ফুলের হাসি শিখে নিয়েছে!

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও তোমার কাছে রেখে দিয়েছ?'

সে বললে, 'এই দেখো-না আমার গলার হার।'

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি।

আমি বললেম, 'আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।'

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, 'মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।'

লজ্জিত হয়ে বললেম, 'বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।'

সে বললে, 'যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি— আমাকে বরণ করে নাও।'

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, 'একি তোমার অপরূপ মূর্তি!'

সে বললে, 'যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।'

আষাঢ় ১৩২৬

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানলার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের রৌদ্র সামনের বাড়ির নিম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে; কাঁচা-আম-ওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, 'মা কোথায়?'

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, 'স্বর্গে।'

২

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুমরে উঠছে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়ালো।

চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে।

উলঙ্গ গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কোথায় স্বর্গের রাস্তা ?'

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

আশ্বিন ১৩২৬

২

গল্প

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, 'গল্প বলো।'

দিদিমা বলতে শুরু করলেন, 'এক রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সদাগরের পুত্তুর—'

গুরুমশায় হেঁকে বললেন, 'তিন-চারে বারো।'

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড়ো হাঁক দিয়েছে রাক্ষসটা, 'হাঁউ মাউ খাঁউ'— নামতার হুংকার ছেলেটার কানে পৌঁছয় না।

যারা হিতৈষী তারা ছেলেকে ঘরে বন্ধ ক'রে গম্ভীর স্বরে বললে, 'তিন-চারে বারো এটা হল সত্য; আর রাজপুত্তুর, কোটালের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর— ওটা হল মিথ্যে, অতএব—'

ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমুদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না; তিন-চারে বারো তার পিছে-পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হিতৈষী মনে করে, নিছক দুষ্টমি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা গুরুমশায়ের গতিক দেখে চুপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায় না, এক যায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বসলেন। তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাক কাটা চলছে তখন হিতৈষী বললেন, 'ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।'

ততক্ষণে হনুমান লাফ দিয়েছে আকাশে, অত ঊর্ধ্বে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পাল্লা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইস্কুলে, ইস্কুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক, ওই কথাটুকু কিছুতেই মরতে চায় না 'গল্প বলো'।

২

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ্য জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, মুখে মুখে, লেখায় লেখায়, গল্প যা জমে উঠেছে তা মানুষের সকল সঞ্চয়কেই ছাড়িয়ে গেছে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গল্পরচনার নেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সব-শেষের নেশা;

তাঁকে শোধন করতে না পারলে মানুষকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারখানা-ঘরে আগুন থেকে জল, জল থেকে মাটি, গড়তে লেগে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি তখন গলদ্‌ঘর্ম, বাষ্পভারাকুল। ধাতু-পাথরের পিণ্ডগুলো তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে; চার দিকে মাল-মসলা ছড়ানো, আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনোমতে মনে করা যেতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমানুষি আছে। তখনকার কাণ্ডকারখানা যাকে বলে 'সারবান'।

তার পরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পশু, উড়ল পাখি। কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঞ্জলি পেতে দাঁড়ালো, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ব্যস্ত, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাঞ্চল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্‌ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় ঊনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সব-ক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ

গড়লেন। এতদিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা! সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত! ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন! নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন এই, 'কী হল হে, কী খবর, তার পরে?' এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুইয়ে মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়; যে রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য; আর সেই ভক্তি-বিমুগ্ধ হনুমানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে হনুমান গন্ধমাদনকে উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ

করে না। এই মানুষের পক্ষে আরঙ্গেব যেমন সত্য দুর্যোধনও তেমনি সত্য। কোন্‌টার প্রমাণ বেশি, কোন্‌টার প্রমাণ কম, সে হিসাবে নয়; কেবল গল্প হিসাবে কোন্‌টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সব চেয়ে সত্য।

মানুষ বিধাতার সাহিত্যলোকেই মানুষ; সুতরাং, না সে বস্তুতে গড়া, না তত্ত্বে— অনেক চেষ্টা করে হিতৈষী কোনোমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না। অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্পের সন্ধি-স্থাপন করতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু চির-কালের স্বভাবদোষে কিছুতে জোড়া মেলাতে পারে না। তখন গল্পও যায় কেটে, হিতকথাও পড়ে খ'সে, আবর্জনা জমে ওঠে।

বৈশাখ ১৩২৭

মীনু

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় ইঁদারার ধারে তুঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত; আর অড়রখেতে যে বুড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে জৌনপুরে হল ওর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে, 'এও বাঁচে কি না বাঁচে।'

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোঁটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার 'পরে যে ঝুমকোলতা লাগিয়েছিল এইবার সেই লতায় কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অন্ন আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে

যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল খাঁদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলায় পরাবে বলে মীনু রঙিন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, 'বউদিদি, এটিকে তুমি নিয়ে যাও।'

মীনুর স্বামী বললে, 'বড়ো হাঙ্গাম, কাজ নেই।'

২

কলকাতার বাসায় দোতলার ঘরে মীনু শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানি দাই কাছে বসে কত কী বকে; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীনুর ঘুম ছিল না। ভোরের আঁধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখতে পেলে তার জানলার নিচেকার গোলক-চাঁপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেছে। তার একটু মৃদু গন্ধ মীনুর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কেমন আছ?'

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ওই রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে প'ড়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীনু বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, 'আহা, দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস।'

এই গাছে কেন যে ক'দিন ফুল দেখা যায় নি একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধ-ফোটা পদ্মের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সাজি-হাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল, যেন খাজনা আদায়ের জন্যে বর্গির পেয়াদা।

মীনু দাইকে বললে, 'শীঘ্র ওই ঠাকুরকে একবার ডেকে আন্।'

ব্রাহ্মণ আসতেই মীনু তাকে প্রণাম করে বললে, 'ঠাকুর, ফুল নিচ্ছ কার জন্যে?'

ব্রাহ্মণ বললে, 'দেবতার জন্যে।'

মীনু বললে, 'দেবতা তো ওই ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'তোমাকে!'

'হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন ব'লে দেন নি।'

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ-নাড়া দিতে শুরু করলে তখন মীনু তার দাইকে বললে, 'ও দাই, এ তো আমি চোখে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।'

৩

পাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীনু তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, 'ওই দেখো, দেখো, ওদের কী সুন্দর ছেলেটি! ওকে একটিবার আমার কোলে এনে দাও-না।'

স্বামী বললে, 'গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন?'

মীনু বললে, 'শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে? সবার কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।'

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, 'দরোয়ান বললে বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।'

পরের দিন বিকেলে মীনু দাইকে ডেকে বললে, 'ওই চেয়ে দেখ্, বাগানে একলা বসে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।'

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, 'ওরা রাগ করেছে।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় তো পুলিসে ধরিয়ে দেবে।'

এক মুহূর্তে মীনুর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বললে, 'আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।'

কার্তিক ১৩২৮

নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহুযত্নে খাতায় সোনালি কালীর কিনারা টেনে তারই গায়ে লতা এঁকে মাঝখানে লাল কালী দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখত। আর, খুব সমারোহে মলাটের উপর লিখত— শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না।

মনে মনে সে স্থির করলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বের করবে।

বাপের মৃত্যুর পর গুরুজনেরা বারবার বললে, 'একটা কোনো কাজের চেষ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।'

সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হল না।

২

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগনেটি।

নতুন ক খ শিখে সে যে বই হাতে পায় চেঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বললে, 'দেখো দেখো মামা, এ যে তোমারই নাম।'

মামা একটুখানি হাসলে, আর আদর ক'রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাক্স খুলে আর-একখানি বই বের করে বললে, 'আচ্ছা, এটা পড়্ দেখি।'

ভাগনে একটি একটি অক্ষর বানান ক'রে ক'রে মামার নাম পড়ল। বাক্স থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইল না। দুই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম আরও অনেক অনেক অনেক বইয়ে আছে—একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?'

মামা চোখ টিপে বললে, 'ক্রমে দেখতে পাবি।'

ভাগনে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

৩

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক।

বন্ধুরা বললে, 'এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।'

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে যেন শহরের গায়ে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটার-বিলাসী বন্ধু থিয়েটার-ওয়ালাদের কাছে অভিমত আনতে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগনেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক খেলা বের করেছে, অন্যমনস্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভাগনে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালী লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

৪

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারী ব্যস্ত।

'কী কানাই, কী করছিস ?'

ভাগনে খুব আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটি মাত্র বই নয়, অন্তত পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

একি কাণ্ড! পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা! আর এ কিরকম খেলা!

কানাইয়ের বহু-দুঃখে-জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীৎকার করে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কেঁদে ওঠে, কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না।

বুড়ি ঝি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে বাবা ?'

কানাই বললে, 'আমার নাম!'

মা এসে বললে, 'কী রে কানাই, কী হয়েছে ?'

কানাই রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'আমার নাম!'

ঝি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি ক্ষীরপুলি এনে দিলে, মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে, 'আমার নাম!'

মা এসে বললে, 'কানাই, এই নে তোর সেই রেল-গাড়িটা।'

কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, 'আমার নাম!'

৫

থিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হল?'

বন্ধু বললে, 'ওরা রাজি হল না।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মামা বললে, 'আমার সর্বস্ব যায় সেও ভালো, আমি নিজে থিয়েটার খুলব।'

বন্ধু বললে, 'আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না?'

ও বললে, 'না, আমার জ্বরভাব।'

বিকেলে মা এসে বললে, 'খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

ও বললে, 'খিদে নেই।'

সন্ধের সময় স্ত্রী এসে বললে, 'তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না?'

ও বললে, 'মাথা ধরেছে।'

ভাগনে এসে বললে, 'আমার নাম ফিরিয়ে দাও।'

মামা ঠাস্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে।

ভাদ্র ১৩২৮

ভুল স্বর্গ

লোকটি নেহাত বেকার ছিল।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের।

ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো ঝিনুক সাজাত। দূর থেকে দেখে মনে হত—যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে; কিম্বা উঁচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি ঝর্না হবে কিম্বা পায়ে-চলা পথ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে পণ করত পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না।

২

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় খামকা পাস করে ফেলে। এর সেই দশা হল।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ মৃত্যুর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর।

কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না। দূতগুলো মার্কা ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই।

এখানে পুরুষরা বলছে, 'হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা?' মেয়েরা বলছে, 'চললুম ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।' সবাই বলে, 'সময়ের মূল্য আছে।' কেউ বলে না 'সময় অমূল্য'। 'আর তো পারা যায় না' ব'লে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারী খুশি হয়। 'খেটে খেটে হয়রান হলুম' এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।

এ বেচারা কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অন্যমনস্ক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে যেখানেই আরাম ক'রে বসতে চায়, শুনতে পায়, সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোঁতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

৩

ভারী এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের

দ্রুত তালের গতের মতো।

তাড়াতাড়ি সে এলো-খোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু-চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব'লে উঁকি মারছে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চঞ্চল ঝর্নার ধারে তমাল গাছটির মতো স্থির।

জানলা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্যার যেমন দয়া হয়, একে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

'আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই ?'

নিশ্বাস ছেড়ে বেকার বললে, 'কাজ করব তার সময় নেই।'

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, 'আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও ?'

বেকার বললে, 'তোমার হাত থেকেই কাজ নেব ব'লে দাঁড়িয়ে আছি।'

'কী কাজ দেব ?'

'তুমি যে ঘড়া কাঁখে ক'রে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পারো—'

'ঘড়া নিয়ে কী হবে ? জল তুলবে ?'

'না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।'

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমার সময় নেই, আমি চললুম।'

কিন্তু, বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন? রোজ ওদের উৎসতলায় দেখা হয়, আর রোজ সেই একই কথা, 'তোমার কাঁখের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।'

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। ভুরু বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এর মানে?'

বেকার লোকটি বললে, 'এর কোনো মানে নেই।'

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল।

সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে। রাত্রে থেকে-থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বেলে চুপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল। তার বয়সে এই সে প্রথম এমন-কিছু দেখেছে যার কোনো মানে নেই।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু যেন বাধা পড়েছে। পা দুটি যেন চলতে চলতে আনমনা হয়ে ভাবছে— যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই।

সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি বললে, 'কী চাও ?'

সে বললে, 'তোমার হাত থেকে আরও কাজ চাই।'

'কী কাজ দেব ?'

'যদি রাজি হও, রঙিন সুতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব।'

'কী হবে ?'

'কিছুই হবে না।'

নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল। এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে। কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায়।

৪

এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল। কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড়ো চিন্তিত হল। সভা ডাকলে। তারা বললে, 'এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটে নি।'

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, 'আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।'

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, 'তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।'

সে তার রঙের ঝুলি আর তূলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, 'তবে চললুম।'

মেয়েটি এসে বললে, 'আমিও যাব।'

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

কার্তিক ১৩২৮

রাজপুত্তুর

রাজপুত্তুর চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাট বাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্তুর সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়?

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল-বিলের জল খাল-বিলের মধ্যেই শান্ত। কিন্তু গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্তুরকে তার রাজ্যটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে? তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাত-সমুদ্র তেরো-নদী পার হয়ে যায়।

মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন ক'রে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে।

সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে ভাবে, 'আমরা সেই রাজপুত্তুর।'

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই

মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈত্যপুরীতে রাজকন্যা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে— আর, যে আমাদের রাজপুত্তুর সে দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকো মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে— 'বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব'।

বাইরে বনের অন্ধকারে বৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে 'দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে'।

২

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো। সেখানে রাজপুত্তুর ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল! এ কোন্ জাতুকরের জাতু!

এ যে শহর! ট্র্যাম চলেছে। আপিস-মুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাঁশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুত্তুরের এ কী বেশ! এ কী চাল! গায়ে বোতাম-খোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতো-জোড়া জীর্ণ। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি করে বাসাখরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়?

তার বাসার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপা ফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল ফোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিন্দে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রের সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও

বিস্তর, আর নাতি-নাৎনির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাব-রাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাসার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে সোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, 'এ ছেলেকে কে বাঁচায়!'

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল, প্রবীণ সব সাক্ষী, দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্য!

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাঁটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘপথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সঙ্গীহীন। কতবার অন্ধকারে

তাকে শুনতে হল 'হাঁউমাউখাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ'। মানুষকে খাবার জন্যে চারি দিকে এত লোভ!

রাস্তার শেষ নেই, কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন, তিনি যম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁওয়ানো অমনি একি কাণ্ড! শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মুহূর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্তুর। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপুরীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্যার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে শিশুরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়— সেই ঘরছাড়া মানুষ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ— সে রাজপুত্তুর।

আশ্বিন ১৩২৮

সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না। বদ্দি বড়ি নিয়ে এল। মধু দিয়ে মেড়ে বললে, 'খাও।' সে ঠেলে ফেলে দিলে।

রাজার কানে খবর গেল। রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল। পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই?'

সে গুমরে উঠে বললে, 'তোমরা সবাই যাও; একবার আমার স্যাঙাৎনিকে ডেকে দাও।'

স্যাঙাৎনি এল। রানী তার হাত ধরে বললে, 'সই, বোসো। কথা আছে।'

স্যাঙাৎনি বললে, 'প্রকাশ করে বলো।'

সুয়োরানী বললে, 'আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর। তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা। তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা। নাটমন্দিরে যাচ্ছি

ময়ূরপংখি চ'ড়ে। আগে লোক, পিছে লশ্‌কর। ডাইনে বাজে বাঁশি, বাঁয়ে বাজে মৃদঙ্গ।

এমন সময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাঁপা গাছের ছায়ায়। বেড়া বেয়ে অপরাজিতার ফুল ফুটেছে, দুয়োরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা। আমার ছত্র-ধারিণীকে শুধোলেম, আহা, ঘরখানি কার? সে বললে, দুয়োরানীর।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জ্বালি নি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

আমি বললেম, এ ঘরে আমি থাকব না।

রাজা বললে, আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদন্তের দেওয়াল দিয়ে। শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তোর ঝিনুক দিয়ে তার কিনারে এঁকে দেব পদ্মের মালা।

আমি বললেম, আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির বাগানের একটি ধারে।

রাজা বললে, আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

'তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো-সাত-জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাল্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাল্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা! যেন নির্মাল্যের ফুল! হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লাল-পেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্যা করে?

ছত্রধারিণী হেসে বললে, চিনতে পারলে না? ঐ তো দুয়োরানী।

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

আমি বললেম, আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।

রাজা বললে, আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লাল-পেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনলেম। দুয়োরের কাছে এসে মনের দুঃখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

'তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পর্দার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চূড়ায় তার বন-ফুলের মালা। হাতে তার ডালি, তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফল, তাতে খেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে?

ছত্রধারিণী বললে, জানো না? ওই তো দুয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্যে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

আমি বললেম, আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।

রাজা বললে, আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী!

সোনার পালঙ্কে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এল। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

'তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধোয়, তোমার কী হয়েছে, কী চাই?

সুয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি স্যাঙাৎনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, ওই দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।'

স্যাঙাৎনি গালে হাত দিয়ে বললে, 'কেন বলো তো।'

সুয়োরানী বললে, 'ওর ওই বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।'

আশ্বিন ১৩২৭

বিদূষক

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনা-মানিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেশ্বরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পুজো দিলেন।

পুজো দিয়ে চলে আসছেন—গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক; সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আম-বাগানে ছেলেরা খেলা করছে।

রাজা তাঁর দুই সঙ্গীকে বললেন, 'দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।'

২

ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?'

তারা বললে, 'কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জিত, কার হার?'

ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, 'কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।'

মন্ত্রীর মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা করে হেসে উঠল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনও ছেলেরা খেলছে।

রাজা হুকুম করলেন, 'এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো আর লাগাও বেত।'

গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, 'ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল, ওদের মাপ করো।'

রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, 'এই গ্রামকে শিক্ষা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে কোনো দিন যেন ভুলতে না পারে।'

এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধেবেলায় সেনাপতি রাজার সমুখে এসে দাঁড়ালো। প্রণাম করে বললে, 'মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারও মুখে শব্দ শুনতে পাবে না।'

মন্ত্রী বললে, 'মহারাজের মান রক্ষা হল।'

পুরোহিত বললে, 'বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।'

বিদূষক বললে, 'মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।'

রাজা বললেন, 'কেন!'

বিদূষক বললে, 'আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।'

বৈশাখ ১৩২৯

৬

ঘোড়া

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির ঘণ্টা বাজে ব'লে, হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাণ্ডারীকে ডেকে বললেন, 'ওহে ভাণ্ডারী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোগাড় ক'রে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।'

ভাণ্ডারী হাত জোড় করে বললে, 'পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ্ তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরুৎ ব্যোম, তা সে যত চাই।'

চতুর্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চার জোড়া গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা ভালো, ভাণ্ডারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।'

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি অপ্ তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নখ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবোনো চলে কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড

থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল, কিন্তু তার লড়াইয়ের শখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না, তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই একে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে 'না' হয়ে যাবে, এই তার মৎলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎ ব্যোম যখন ক্ষিতি অপ্ তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এই রকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড়ো খুশি হলেন। বাসার জন্যে তিনি অন্য জন্তুর কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু

এর দৌড় দেখতে ভালোবাসেন বলে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি ক'রে সে যা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবে, 'এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো সুবিধে।'

ফাঁস লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা-লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁখে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলা-মলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে।— প্রাণীটাকে মরুৎ ব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উসকে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার 'পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল

ততটা হল না; তবু, চুন বালি খসে দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হতে লাগল।

এতে মানুষের মনে বড়ো রাগ হল। বললে, 'একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট প্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।'

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠে-পড়ে ডাণ্ডা চালালে যে ওর আর লাথি চলল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, 'আমার এই বাহনটির মতো এমন ভক্ত বাহন আর নেই।'

তারা তারিফ করে বললে, 'তাই তো একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা! তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।'

একে তো গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শূন্যে লাথি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই, মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়া-পড়শিরাও ভাবে আওয়াজটা তো ঠিক ভক্তি-গদ্‌গদ শোনাচ্ছে না। মুখ বন্ধ করবার অনেকরকম যন্ত্র বেরোল। কিন্তু, দম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমূর্ষুর খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমারই কীর্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ!'

যম বললেন, 'সৃষ্টিকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।'

ব্রহ্মা দেখেন অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, 'আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।'

মানুষ বললে, 'ছি ছি, তাতে হিংস্রতার বড়ো প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বলো পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগ্যই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েছি। খাসা আস্তাবল।'

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, 'ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।'

মানুষ বললে, 'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বলো, তোমার মাঠের চেয়ে আমার

আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে খত দিতে রাজি আছি।'

মানুষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের দুটো পায়ে ক'সে রশি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চাল-চলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'ভুল করেছি তো।'

মানুষ হাত জোড় করে বললে, 'এখন এটাকে নিয়ে করি কী? আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে তো বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই?'

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।'

মানুষ বললে, 'আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা!'

ব্রহ্মা বললেন, 'সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব।'

বৈশাখ ১৩২৬

কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশসুদ্ধ সবাই বলে উঠল, 'তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে!'

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, 'আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে?'

তা বলে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, 'ভাবনা কী? লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক্‌-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।'

২

দেশের লোক ভারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা, ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্যে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, সুতরাং কারও জন্যে মাথাব্যথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজের ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা খায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশসুদ্ধ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, 'এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সব চেয়ে আদিম চলা। একেই বলে অদৃষ্টের চালে চলা। সৃষ্টির প্রথম চক্ষুহীন কীটাণুরা এই চলা চলত; ঘাসের মধ্যে, গাছের মধ্যে, আজও এই চলার আভাস প্রচলিত।'

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদিম আভিজাত্য অনুভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভুতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্যে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো ক'রে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব!

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা হাটে বিকোতে পারে— বেরোবার মধ্যে বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে ক'রে ভূতের রাজত্বে আর কিচ্ছুই না থাক্— অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, স্বাস্থ্য হোক— শান্তি থাকে।

কত যে শান্তি তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঝার খোঁজ করে, এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা, ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারও মনে দ্বিধা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটায় বাঁধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চুপ করে পড়ে থাকে মাটিতে যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্যে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের খর্পরে ঢেলে দেবার জন্যে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এ দিকে দিব্যি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল'।

সেটা খোকার পক্ষে আরামের, খোকার অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা গেল, 'এমন হল কেন?'

তারা একবাক্যে শিখা নেড়ে বললে, 'এটা ভূতের দোষ নয়, ভুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন!'

শুনে সকলেই বললে, 'তা তো বটেই।' অত্যন্ত সান্ত্বনা বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেঁকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, 'খাজনা দাও।' আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, 'খাজনা দাও।'

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে, 'খাজনা দেব কিসে?'

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে বেবাক ধান খেয়ে গেল, কারও হুঁশ ছিল না। জগতে যারা হুঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চূড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন,

'বেহুঁশ যারা তারাই পবিত্র, হুঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হুঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকো, প্রবুদ্ধমিব সুপ্তঃ।'

শুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না 'খাজনা দেব কিসে'।

শ্মশান থেকে, মশান থেকে, ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক'রে তার উত্তর আসে, 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে!'

প্রশ্নমাত্রেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, 'ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে?'

শুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসতুতো-পিসতুতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, 'কী সর্বনাশ! এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি! তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে— সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?'

প্রশ্নকারী বলে, 'সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির ঝাঁক, আর উপস্থিততম বর্গির দল, এদের কী করা যায়?'

মাসিপিসি বলে, 'বুলবুলির ঝাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বর্গির দলকেও।'

অর্বাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, 'যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।'

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, 'চুপ! এখনো ঘানি অচল হয় নি।'

শুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মানুষ, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাত্রে হাত জোড় করে বলে, 'কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি?'

কর্তা বলেন, 'ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।'

তারা বলে, 'ভয় করে যে কর্তা!'

কর্তা বলেন, 'সেইখানেই তো ভূত।'

শ্রাবণ ১৩২৬

তোতা-কাহিনী

এক যে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা-কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, 'এমন পাখি তো কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।'

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'পাখিটাকে শিক্ষা দাও।'

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, 'উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কী?'

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিদ্যা বেশি ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে, দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, 'শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ।' কেহ বলে, 'শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল!'

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন, 'অল্প পুঁথির কর্ম নয়।'

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, 'সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!'

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, 'উন্নতি হইতেছে।'

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার

জন্য লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্ধুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, 'খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।'

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের; ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।'

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

শিক্ষা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য

লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি দামামা কাঁসি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্প। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারক-নবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ কাণ্ডটা দেখিতেছেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'আশ্চর্য! শব্দ কম নয়!'

ভাগিনা বলিল, 'শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই।'

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, 'মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি?'

রাজার চমক লাগিল; বলিলেন, 'ওই যা! মনে তো ছিল না। পাখিটাকে দেখা হয় নাই।'

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, 'পাখিকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই।'

দেখা হইল। দেখিয়া বড়ো খুশি। কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই

যায় না; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই, পানি নাই; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান তো বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা সর্দারকে বলিয়া দিলেন, নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্রদস্তুর-মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকাল বেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্যায় রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায়, সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, 'একি বেয়াদবি!'

তখন শিক্ষামহলে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কী দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া

বলিল, 'এ রাজ্যে পাখিদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।'

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া, এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে, কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই।

নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল, 'পাখি মরিয়াছে।'

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, 'ভাগিনা, এ কী কথা শুনি!'

ভাগিনা বলিল, 'মহারাজ, পাখিটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।'

রাজা শুধাইলেন, 'ও কি আর লাফায়?'

ভাগিনা বলিল, 'আরে রাম!'

'আর কি ওড়ে?'

'না।'

'আর কি গান গায়?'

'না।'

'দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?'

'না!'

রাজা বলিলেন, 'একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।'

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল।

রাজা পাখিটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌খস্ গজ্‌গজ্ করিতে লাগিল।

•

বাহিরে নব বসন্তের দক্ষিণহাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

মাঘ ১৩২৪

অস্পষ্ট

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা। রেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দিয়ে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোখ গেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আর-একটি মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সতেরো।

সেই প্রবীণা জানালার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আর-একদিন দেখা গেল, চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে পড়ে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

তার পর দেখা যায় জানালার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতিদিনের কাজের ধারা।—কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা; জাঁতি হাতে সুপুরি কাটা; স্নানের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজে চুল শুকোনো; বারান্দার রেলিঙের উপরে বালাপোষ রোদ্দুরে মেলে দেওয়া।

দুপুর বেলায় পুরুষেরা আপিসে; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্‌বকম্‌ মিইয়ে আসে।

সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চিলে-কোঠায় পা মেলে বই পড়ে; কোনো দিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা লিখছে চিঠি, খানিকটা খেলছে কলম নিয়ে, আর আল্‌সের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের আঁঠি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্যমনা চাঁদের কণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি আধাবয়সি। তার মোটা হাতে মোটা কাঁকন। তার সামনের চুল ফাঁক, সেখানে সিঁথির জায়গায় মোটা সিঁদুর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচমকা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখি হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কখনো বা গভীর রাতে, কখনো বা সকালে বিকালে, ওই বাড়ি থেকে এমন-সব আভাস আসে যার থেকে বোঝা যায়,

সংসারটার তলা ফাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্তে মাথা ঠুকছে।

এ দিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা—ক্ষণে ক্ষণে দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলায়।

এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্তিকমাসের সন্ধ্যা-বেলা; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলছে, আস্তাবলের ধোঁওয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিশ্বাস বন্ধ করে দিলে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুলল অমনি তার চোখে পড়ল, সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তার পরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্‌সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল, সে চিঠি যেন না পৌঁছয়। সকাল বেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল; কোথায়

গেল কাউকে বলে গেল না।

কলেজ খোলবার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়!

বনমালী বলে উঠল, 'যাক, ভালোই হয়েছে।'

ঘরে ঢুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব-নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট্‌আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুলতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে; শপথ করে বললে, 'এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।'

শ্রাবণ ১৩২৬

পট

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারও কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, 'ধনী ছিলেম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিন-রাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে?'

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সে-দিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তূলি সেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মানুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাতজোড় করে বললে, 'এই জন্যেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম! এতদিনে বর দিলে কি এই অপমান!'

২

এমন সময় রথের মেলা বসল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশ্‌কর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, 'আমি কিনব।'

অভিরাম তার নফরকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছেলেটি কে?'

সে বললে, 'আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।'

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, 'বেচব না।'

শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে খায় না, মুখ ভার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলি-ভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহর-ভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, 'এত বড়ো স্পর্ধা!'

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, 'এই আমার জিত।'

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো

পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, 'বুঝতে পেরেছি।'

আজ সে স্পষ্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠছে।

তূলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, 'মন্ত্রীরই জিত হল।'

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মন্ত্রীকে অভিরাম বললে, 'এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ো।'

মন্ত্রী বললে, 'কত দাম?'

অভিরাম বললে, 'আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।'

মন্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলে না।

ভাদ্র ১৩২৮

নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্যে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার-কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কায়দা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, 'লোকটা সাহস দেখিয়েছে।'

প্রবীণের দল বললে 'একে বলে সাহস! এ তো স্পর্ধা।'

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। একালের রাজকন্যারা বলে, 'আমাদের এই পুতুল চাই।'

সাবেক কালের অনুচরেরা বলে, 'আরে ছিঃ!'

শুনে তাদের জেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকা-ভরা

পুতুল যেন খেয়ার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ও পারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই ভুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুল-হাটের সর্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষ-কালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, 'তুমি আমার বাড়িতে এসো।'

জামাই বললে, 'খাও দাও, আরাম করো, আর সব্‌জির খেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখো।'

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকর্‌নার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নৌকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাৎনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় ব'সে বুড়ো খেত আগলায় আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে, সেখানে নাৎনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, 'কী দাদি, কী চাই?'

নাৎনি বলে, 'আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।'

বুড়ো বলে, 'আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন?'

নাৎনি বলে, 'তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।'

বুড়ো বলে, 'কেন, কিষণলাল।'

নাৎনি বলে, 'ইস! কিষণলালের সাধ্যি!'

দুজনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মাল-মশলা বের করে; চোখে মস্ত গোল চশমাটা আঁটে।

নাৎনিকে বলে, 'কিন্তু দাদি, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে।'

নাৎনি বলে, 'দাদা, আমি কাক তাড়াব।'

বেলা বয়ে যায়; দূরে ইঁদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে; নাৎনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে, হুঁশ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত দুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, 'দুধ দোওয়া পড়ে থাক্, আর তুমি সুভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুল খেলার বয়স?'

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সুভদ্রা খেলবে কেন? এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলায় মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।'

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, 'রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে!'

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চুপ করে বসে রইল।

সুভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, 'দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।'

৪

দু দিন পরে সুভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, 'এই নাও, আমার দাদার পুতুলের দাম।'

মা বললে, 'কোথায় পেলি?'

মেয়ে বললে, 'রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেছি।'

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, 'দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।'

মা খুশি হয়ে বললে, 'এমন ষোলোটা মোহর হলেই তো সুভদ্রার গলার হার হবে।'

বুড়ো বললে, 'তার আর ভাবনা কী!'

সুভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'দাদাভাই, আমার বরের জন্যে তো ভাবনা নেই।'

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

৫

বুড়োর যৌবন যেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর সুভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইঁদারায় বলদে ক্যাঁ-কোঁ করে জল টানে।

একে একে ষোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল। মা বললে, 'এখন বর এলেই হয়।'

সুভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, 'দাদাভাই, বর

ঠিক আছে।'

দাদা বললে, 'বল্‌ তো দাদি, কোথায় পেলি বর?'

সুভদ্রা বললে, 'যেদিন রাজপুরীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও? আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতুল এখনকার দিনে চলবে না। ব'লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ওই পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।'

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'সে আছে কোথায়?'

নাৎনি বললে, 'ওই যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।'

বর এল ঘরের মধ্যে, বুড়ো বললে, 'এ যে কিষণলাল!'

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'হাঁ, আমি কিষণলাল।'

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, 'ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।'

নাৎনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, 'দাদা, তোমাকে সুদ্ধ।'

ভাদ্র ১৩২৮

উপসংহার

ভোজরাজের দেশে যে মেয়েটি ভোরবেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় সে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য বলেন, একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি সুর লাগল। তার পরে সেইদিন যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি তখন এই মেয়েটিকে ফুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।'

সেই অবধি আচার্য মেয়েটিকে আপন তম্বুরাটির মতো কোলে নিয়ে মানুষ করেছে; এর মুখে যখন কথা ফোটে নি এর গলায় তখন গান জাগল।

আজ আচার্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভালো দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মতো মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেয়েটির গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্যের বুক কেঁপে ওঠে; বলেন, 'যে বোঁটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।'

মেয়েটি বলে, 'তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।'

আচার্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, 'যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল সেই গান তোরই মধ্যে রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তা হলে আমার

চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।'

২

ফাগুনপূর্ণিমায় আচার্যের প্রধান শিষ্য কুমারসেন গুরুর পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, 'মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দুজনে মিলে আপনার চরণসেবা করি।'

আচার্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, 'আনো দেখি আমার তম্বুরা। আর, তোমরা দুইজনে রাজার মতো, রানীর মতো, আমার সামনে এসে বোসো।'

তম্বুরা নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন। দুলহা-দুলহীর গান, সাহানার সুরে। বললেন, 'আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।'

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁইফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে। শেষে তম্বুরাটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, 'বৎস, এই লও আমার যন্ত্র।'

তার পরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এই লও আমার প্রাণ।'

তার পরে বললেন, 'আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।'

মাধবী আর কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ

আর পূর্ণচাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময়ে দ্বারে এল রাজদূত, গান থেমে গেল।

আচার্য কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজের কী আদেশ?'

দূত বললে, 'তোমার মেয়ের ভাগ্য প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।'

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ইচ্ছা তাঁর?'

দূত বললে, 'আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাম্বোজে পতিগৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।'

রাত পোয়ালো, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে, 'আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।'

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

৪

রাজকন্যার ময়ূরপংখি আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাল্কি। সে পাল্কি কিংখাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বত্থডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখিরা গান গাইছিল পলাশের ডালে; আমের বোলের গন্ধে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্যার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগুনসন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জন্য উতলা হয়, এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিশ্বাস ফেললে।

বৈশাখ ১৩২৯

পুনরাবৃত্তি

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন।

দেখতে পেলেন প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটো ছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কী খেলছ?'

তারা বললে, 'আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।'

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, 'এই আমাদের দণ্ডকবন, এখানে কুটীর বাঁধছি।'

সে একরাশ ভাঙা ডাল-পালা খড়-ঘাস জুটিয়ে এনেছে, ভারি ব্যস্ত।

আর, মেয়েটি শাক-পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে; রাম খাবেন, তারই আয়োজনে সীতার একদণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, 'আর তো সব দেখছি, কিন্তু রাক্ষস কোথায়?'

ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ত্রুটি আছে।

রাজা বললেন, 'আচ্ছা, আমি হব রাক্ষস।'

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, 'তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।'

রাজা বললেন, 'আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।'

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সুচারুরূপে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশ-বারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতাযুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখি ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমনি করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলে মেয়ে দুটি কার?'

মন্ত্রী বললে, 'মেয়েটি আমারই, নাম রুচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।'

রাজা বললেন, 'যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ওই মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।'

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

২

দেশে সব চেয়ে যিনি বড়ো পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চ বংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে রুচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট রুচিরার। কেননা ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয় সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

রুচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, রুচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল, সেটা খুব সহজেই ঘটবে; কারণ, কৌশিক পড়ে বটে, কিন্তু একমনে নয়। তার সাঁতার কাটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে যন্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'বিদ্যায় তোমার অনুরাগ নেই কেন?'

সে বলে, 'আমার অনুরাগ শুধু বিদ্যায় নয়, আরও নানা জিনিসে।'

অধ্যাপক বলেন, 'সে-সব অনুরাগ ছাড়ো।'

সে বলে, 'তা হলে বিদ্যার প্রতিও আমার অনুরাগ থাকবে না।'

৩

এমনি করে কিছুকাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?'

অধ্যাপক বললেন, 'রুচিরা।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কৌশিক?'

অধ্যাপক বললেন, 'সে যে কিছুই শিখেছে এমন বোধ হয় না।'

রাজা বললেন, 'আমি কৌশিকের সঙ্গে রুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।'

অধ্যাপক একটু হাসলেন; বললেন, 'এ যেন গোধূলির সঙ্গে ঊষার বিবাহের প্রস্তাব।'

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'তোমার কন্যার সঙ্গে কৌশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আমার কন্যা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।'

রাজা বললেন, 'স্ত্রীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?'

মন্ত্রী বললে, 'তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।'

রাজা বললেন, 'সে কি মনে করে কৌশিক তার অযোগ্য?'

মন্ত্রী বললে, 'হাঁ, সেই কথাই বটে।'

রাজা বললেন, 'আমার সামনে দুজনের বিদ্যার পরীক্ষা হোক। কৌশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।'

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বললে, 'এই পণে আমার কন্যার মত আছে।'

৪

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে ব'সে, কৌশিক তাঁর সিংহাসনতলে।

স্বয়ং অধ্যাপক রুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও রুচিকে নমস্কার করলে। রুচি দৃক্‌পাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতি-পালনের জন্যেও কৌশিক রুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অন্য ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই,

আজ যখন তার যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্‌মিক্ করে উঠল তখন গুরু বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। রুচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাক্‌রোধ হল, আর রুচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'এখন বিবাহের দিন স্থির করো।'

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড়হাতে রাজাকে বললে, 'ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ আমি করব না।'

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'জয়লব্ধ পুরস্কার গ্রহণ করবে না?'

কৌশিক বললে, 'জয় আমারই থাক্, পুরস্কার অন্যের হোক।'

অধ্যাপক বললেন, 'মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।'

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়, কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের উপর দেখা যায়।

এ দিকে রুচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু, রুচির সমস্ত মন কোথায়?

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এখনও যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয়বার তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।'

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার জন্যেই যেন সে তপস্যা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্যা যেমন অনশনের, রুচির তপস্যা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই রইল, এমন-কি, কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে বললেন, 'কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর কখনো স্ত্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদ-বেদান্তের পার পেয়েছি, স্ত্রীজাতির মন বুঝতে পারলেম না।'

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, 'ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্যার সম্বন্ধ এসেছে। কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কন্যা কী বলে?'

মন্ত্রী বললে, 'মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়?'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার চোখের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে?'

মন্ত্রী চুপ করে রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, 'তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।'

রুচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়ালো।

রাজা বললেন, 'বৎসে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?'

রুচিরা স্মিতমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, 'আজ সেই রামের বনবাস-খেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।'

রুচিরা মুখের এক পাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল।

রাজা বললেন, 'বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনছি বৎসে, এবার সীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।'

রুচিরা কোনো কথা না বলে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, 'কিন্তু, বৎসে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।'

রুচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বললেন, 'এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।'

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না এই তার পণ। তাই, কঠিন সন্ধানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে করে তার জন্যে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝর্নার জল।

ক্রমে তপস্যা এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখিতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরও কিছুদিন গেল। তখন ঝর্নার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, 'এখন আমি করব কী! আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।'

তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ের কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধ'রে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্বীর কাছে রোদও যা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের

কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, 'কেমন আছ?'

কাঠকুড়নি বলত, 'আমার ভালোই কী আর মন্দই কী? কিন্তু, তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই? তোমার মা, তোমার বোন?'

সে বলত, 'আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কী? তারা কি আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?'

কাঠকুড়নি বলত, 'প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্যে এত দরদ।'

তাপস বলত, 'আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।'

এই বলে সে কত কী বলে যেত; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে?

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ূরীর যেমন হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরও কিছুদিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরও কিছুদিন যায়। তপস্বীর চোখ

বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল, সে আর ওই তাপসের মাঝখানে যেন তপস্যার লক্ষযোজন ক্রোশের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হয়ে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই-বা রইল আশা। তবু ওর কান্না আসে; মনে মনে বলে, দিনে একবার যদি বলেন 'কেমন আছ' তা হলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, এক বেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তা হলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে।

৩

এ দিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌঁছল, মানুষ মর্ত্যকে লঙ্ঘন করে স্বর্গ পেতে চায়— এত বড়ো স্পর্ধা!

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন। বললেন, 'দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে!'

মেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, 'যাও, তপস্যা ভঙ্গ করো গে।'

মেনকা বললেন, 'সুররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্ত্যের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব।

মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই?’

ইন্দ্র বললেন, ‘সে কথা সত্য।’

৪

ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়ার দোলা লাগতেই মর্মরিত মাধবীলতা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল। তার মনের ভাবনাগুলি চাক-ছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পালা শেষ হল। এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহায়। তাই সে চোখ মেলল।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেছে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুসুম্ভ ফুলে রঙ করা। যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না। যেন সে এমন একটি জানা সুর যার পদগুলি মনে পড়ছে না। যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল— চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল। বললে, 'আমি দূর দেশে যাব।'

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন প্রভু ?'

তপস্বী বললে, 'তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্যে।'

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, 'দর্শনের পুণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে ?'

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর-কিছু বলল না।

৫

তার অনুরোধ যেমনি রাখা হল অমনি মেয়েটির বুকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বজ্রসূচি বিঁধতে লাগল।

সে ভাবলে, 'আমি অতি সামান্য, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে !'

সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়ালো, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। সুখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু, তার পরেই নদীর ধারে শিরীষ গাছের ছায়ায়

তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, 'প্রভু, আশীর্বাদ চাই।'

তপস্বী জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন?'

মেয়েটি বললে, 'আমি বহুদূর দেশে যাব।'

তপস্বী বললে, 'যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।'

৬

একদিন তপস্যা পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, 'স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।'

তপস্বী বললে, 'তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।'

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চাও?'

তপস্বী বললে, 'এই বনের কাঠকুড়নিকে।'

মাঘ-ফাল্গুন ১৩২৮

প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল। মন বললে, 'ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।'

কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আসবে বলে একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝর্না কাকে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়ে-চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নব-বধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, 'তুমি কবে ফিরে আসবে? এসো, এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

এই আসা-যাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল এ কথা কে জানত? সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুনতে পায়, 'তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।'

মনে মনে ভাবতে লাগল, 'এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?'

৩

এমন সময় সূর্য উঠল পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্‌মিল্‌ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চাল-চলনে— বড়ো মেয়ে দুটি কৌতুকে মুখ একটুখানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়ে দুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলাঠেলি করে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝর্নাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে, 'আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি?'

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়লে, 'তুমি কবে ফিরে আসবে? এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।'

বৈশাখ ১৩২৯

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে। তাই রানী রাজাকে বললে, 'চলো রথ দেখতে যাই।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা।'

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেরোল, হাতিশাল থেকে হাতি। ময়ূরপংখি যায় সারে সারে, আর বল্লম-হাতে সারে সারে সিপাই-সান্ত্রি। দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির ঝাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সর্দার এসে দয়া করে তাকে বললে, 'ওরে, তুই যাবি তো আয়।'

সে হাত জোড় করে বললে, 'আমার যাওয়া ঘটবে না।'

রাজার কানে কথা উঠল, সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বললে, 'ওকেও ডেকে নিয়ো।'

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যখন সেইখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, 'ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল।'

সে হাত জোড় করে বলল, 'কত চলব? ঠাকুরের

দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছুই এমন সাধ্য কি আমার আছে?'

মন্ত্রী বললে, 'ভয় কী রে তোর, রাজার সঙ্গে চলবি।'

সে বললে, 'সর্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ!'

মন্ত্রী বললে, 'তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘটবে না?'

সে বললে, 'ঘটবে বৈকি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার দুয়ারে আসেন।'

মন্ত্রী হেসে উঠল। বললে, 'তোর দুয়ারে রথের চিহ্ন কই?'

দুঃখী বললে, 'তাঁর রথের চিহ্ন পড়ে না।'

মন্ত্রী বললে, 'কেন বল্ তো।'

দুঃখী বললে, 'তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে।'

মন্ত্রী বললে, 'কই রে সেই রথ!'

দুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার দুয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্যমুখী ফুটে আছে।

বৈশাখ ১৩২৭

সওগাত

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাণ্ড ভ'রে ক্ষীর দই, পাত্র ভ'রে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়ো ছেলে বিদেশে রাজ-সরকারে কাজ করে; মেজো ছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুটুম্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলেটি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে দেখছে— ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাসদাসী, থালাগুলি রঙ-বেরঙের রুমালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষ নৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিরুদ্দেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, 'মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না!'

মা হেসে বললেন, 'সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখ্।'

এই বলে তার কপালে চুম্বন করলেন।

ছেলে কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, 'সওগাত পাব না?'

'যখন দূরে যাবি তখন সওগাত পাবি।'

'আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে?'

মা তাকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন; বললেন, 'এই তো আমার হাতের জিনিস।'

পৌষ ১৩২৬

মুক্তি

বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্তি গড়তে বসল। তার মনের মধ্যে যে মানুষটি ছিল, বাইরে তারই প্রতিরূপ প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রূপটি একদিন তার চিত্তপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে যেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো স্মৃতির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে যেন মুদে এল।

মেয়েটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণশয্যায় পড়ে থাকে।

মূর্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমূর্তি রইল না। মনে হল, এ যেন কোনো বিশেষ মানুষের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়।

মূর্তিকে তখন সে গয়না দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো-এক পদ্মের ডালি দিয়ে পুজো করে, সন্ধেবেলায় তার সামনে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বালে—সে প্রদীপ সোনার, সে তেলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গয়না বেড়ে ওঠে, পুজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্তিকে দেখা যায় না।

২

এক ছেলে এসে তাকে বললে, 'আমরা খেলব।'

'কোথায় ?'

'ঐখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।'

মেয়ে তাকে হাঁকিয়ে দেয়; বলে, 'এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।'

আর-এক ছেলে এসে বলে, 'আমরা ফুল তুলব।'

'কোথায় ?'

'ঐ-যে, তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।'

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, 'এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।'

আর-এক ছেলে এসে বলে, 'প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।'

'প্রদীপ কোথায় ?'

'ঐ যেটা তোমার পুতুলের ঘরে জ্বালো।'

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়; বলে, 'ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।'

৩

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। ক্ষণকালের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

মেলার দিন কাছে এল।

পাড়ার বুড়ো এসে বললে, 'বাছা, মেলা দেখতে যাবি নে?'

মেয়ে বললে, 'আমি কোথাও যাব না।'

সঙ্গিনী এসে বললে, 'চল্, মেলা দেখবি চল্।'

মেয়ে বললে, 'আমার সময় নেই।'

ছোটো ছেলেটি এসে বললে, 'আমায় সঙ্গে নিয়ে মেলায় চলো-না।'

মেয়ে বললে, 'যেতে পারব না, এইখানে যে আমার পুজো।'

৪

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে যেন শুনতে পেলে সমুদ্রগর্জনের মতো শব্দ। দলে দলে দেশ-বিদেশের লোক চলেছে—কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হেঁটে; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা ফেলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে

পাখির গান আর শোনা যায় না। ওর হঠাৎ মনে হল, 'আমাকেও যেতে হবে।'

অমনি মনে পড়ে গেল, 'আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।'

তখনই ছুটে চলল তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে।

গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায়! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে লোক চলে, বিশ্রাম নেই।

'এইখানে যাঁকে বসিয়ে রেখেছিলেম সে কোথায়?'

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, 'যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।'

এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, 'আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।'

'কোথায়?'

ছেলে বললে, 'মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?'

মেয়ে বললে, 'হাঁ, আমিও যাব।'

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মূর্তির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলে।

পৌষ ১৩২৬

পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশ-বিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, 'বাহ্লীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্টি।'

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বললে, 'গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন দ্রাক্ষালতায় আঙুরের গুচ্ছ।'

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বললে, 'কাম্বোজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্তরেখাটির মতো বাঁকা চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জ্বল।'

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, 'এর কারণ?—ডাকো দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, 'তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন?'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'মহারাজ, যখন থেকে তোমার

ছেলে পরীস্থানের কাহিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করবে।'

২

রাজার হুকুম হল, পরীস্থান কোথায় খবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীস্থানের কোনো ইশারা মেলে না।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, 'সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম— এলা-দ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে; মৃগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারুবনে, কোথাও পরীস্থানের কোনো ঠিকানা পাই নি।'

রাজা বললে, 'ডাকো মন্ত্রীর পুত্রকে।'

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরী-স্থানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে?'

মন্ত্রীর পুত্র বললে, 'সেই-যে আছে নবীন পাগলা বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীস্থানের গল্প শোনে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা, ডাকো তাকে।'

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়ালো। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'পরী-স্থানের খবর তুমি কোথায় পেলে ?'

সে বললে, 'সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া-আসা।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় সে জায়গা ?'

পাগলা বললে, 'তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'সেইখানে পরী দেখা যায় ?'

পাগলা বললে, 'দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি তাদের চেন কী উপায়ে ?'

পাগলা বললে, 'কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।'

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, 'এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।'

৩

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

ফাল্গুন মাসে তখন ডালে ডালে শাল ফুলে ঠেলা-ঠেলি, আর শিরীষ ফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে।

রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝর্না ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যক-সরোবরে; গ্রামের লোক তাকে বলে 'উদাস-ঝোরা'। সেই ঝর্নাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে।

এক মাস কেটে গেল। গাছে গাছে যে কচি পাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরা ফুলে বনপথ ছেয়ে যায়। এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাঁশির সুর এল। জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, 'আজ পাব দেখা।'

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে ঝর্নাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌঁছল কাম্যক-সরোবরের ধারে। দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বসে আছে। ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না। কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষ ফুল পরেছে, গোধূলিতে যেন প্রথম তারা।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, 'তোমার ওই কানের শিরীষ ফুলটি আমাকে দেবে ?'

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী। ঘাড় বেঁকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল— ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, 'এই নাও।'

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো।'

শুনে একবার মুখে দেখা দিল বিস্ময়, তার পরেই আশ্বিন-মেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর থামতে চায় না।

রাজপুত্র মনে ভাবল, 'স্বপ্ন বুঝি ফলল— এই হাসির সুর যেন সেই বাঁশির সুরের সঙ্গে মেলে।'

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে, বললে, 'এসো।'

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না। তার জল-ভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহু কুহু কুহু কুহু।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার নাম কী?'

সে বললে, 'আমার নাম কাজরী।'

উদাস-ঝোরার ধারে দুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, 'এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।'

সে বললে, 'আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।'

রাজপুত্র বললে, 'আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।'

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, 'এর হাসির সুর এই ঝর্নার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝর্নার পরী।'

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, 'এ-সব কেন?'

রাজপুত্র বললে, 'তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।'

তখন তার চোখ ছল্‌ছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্যে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল, তার বাপ আর ভাই

শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে আর গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইছে।

সে বললে, 'না, আমি যাব না।'

কিন্তু, ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি কাঁসি দামামা, ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল রাজমহিষী কপাল চাপড়ে বললে, 'এ কেমনতরো পরী!'

রাজার মেয়ে বললে, 'ছি ছি, কী লজ্জা!'

মহিষীর দাসী বললে, 'পরীর বেশটাই বা কী রকম!'

রাজপুত্র বললে, 'চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেছে।'

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কি না। দেখে যে, কালো মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি যেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি প্রতিমা। রাজপুত্র চুপ করে বসে ভাবে, 'পরী কোথায় লুকিয়ে

রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো !'

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল।

কাজরী সকাল বেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, 'আজ তোমাকে ছাড়ব না— নিজরূপ প্রকাশ করো, আমি দেখি।'

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে তুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুত্র বললে, 'তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে ?'

সে বললে, 'না, আর নয়।'

রাজপুত্র বললে, 'তবে এইবার কার্তিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।'

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝ-গগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতের সুরে ঝিমি ঝিমি তান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা প'রে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুকল ; পরী-বৌয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা

কুন্দফুল রাশ-করা; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আর, কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুম্বে ঘর ভরে গেল।

পরী কই?

রাজপুত্র বললে, 'চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।'

বৈশাখ ১৩২৯

প্রাণমন

আমার জানলার সামনে রাঙামাটির রাস্তা।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে, সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায় করে হাটে যায়, সন্ধ্যা-বেলায় কলহাস্যে ঘরে ফেরে।

কিন্তু, মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই।

জীবনের যে ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্‌বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। শরীর আজ রুগ্‌ণ, মন আজ নিরাসক্ত।

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহির-তলের সমুদ্র; ভিতর-তলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের, অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

তেমনি আমার সচেষ্ট প্রাণ যখনই ছুটি পেল তখনই সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র।

পথ-চলা পথিক যতদিন ছিলুম ততদিন পথের ধারের ওই বটগাছটার দিকে তাকাবার সময় পাই নি;

আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেছি, আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা শুরু হল।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে। যেন বলতে চায়, 'বুঝতে পারছ না?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'বুঝেছি, সব বুঝেছি। তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না।'

কিছুক্ষণের জন্যে আবার শান্ত হয়ে যায়। আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে; আবার সেই থর্‌থর্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ঝল্‌মল্‌।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, 'হাঁ হাঁ, ওই কথাই বটে; আমি তোমারই খেলার সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির খেলাঘরে আমিও গণ্ডূষে গণ্ডূষে তোমারই মতো সূর্যালোক পান করেছি, ধরণীর স্তন্যরসে আমিও তোমার অংশী ছিলেম।'

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি, ও বলতে থাকে, 'হাঁ, হাঁ, হাঁ।'

যে ভাষা রক্তের মর্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, যা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ আবর্তনধ্বনি, সেই ভাষা ওর পত্রমর্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয়। সেই ভাষা বিশ্ব-জগতের সরকারি ভাষা।

তার মূল বাণীটি হচ্ছে, 'আছি, আছি! আমি আছি, আমরা আছি!'

সে ভারি খুশির কথা। সেই খুশিতে বিশ্বের অণু্ পরমাণু্ থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

ওই বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক ভাষায় সেই এক খুশির কথা চলেছে।

ও আমাকে বলছে, 'আছ হে বটে ?'

আমি সাড়া দিয়ে বলছি, 'আছি হে মিতা !'

এমনি ক'রে 'আছি'তে 'আছি'তে একতালে করতালি বাজছে।

২

ওই বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ শুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল। তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ার সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তার পরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল ; ওরও পাতার রঙ মেঘের মতো গম্ভীর হয়ে এসেছে। আজ সেই পাতার রাশ প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মতো নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরিবের মেয়েটির মতো ; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী, যেন পর্যাপ্ত পরিতৃপ্তির চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝল্‌মলিয়ে আমাকে বললে, 'মাথার উপর অমনতরো

ইঁট পাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন? আমার মতো একেবারে ভরপুর বাইরে এসো-না।'

আমি বললেম, 'মানুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়।'

গাছ ন'ড়েচ'ড়ে বলে উঠল, 'বুঝতে পারলেম না।'

আমি বললেম, 'আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।'

গাছ বললে, 'সর্বনাশ! ভিতরেরটা আছে কোথায়!'

'আমার আপনারই ঘেরের মধ্যে।'

'সেখানে কর কী?'

'সৃষ্টি করি।'

'সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।'

আমি বললেম, 'যেমন তীরের মধ্যে বাঁধা পড়ে হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা পড়েই তো সৃষ্টি। একই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা পড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।'

গাছ বললে, 'তোমার ঘেরটা কী রকম শুনি।'

আমি বললেম, 'সেইটি আমার মন। তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠছে।'

গাছ বললে, 'তোমার সেই বেড়া-ঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্রসূর্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায়?'

আমি বললেম, 'চন্দ্রসূর্যকে দিয়ে তাকে তো মাপা যায় না, চন্দ্রসূর্য যে বাইরের জিনিস।'

'তা হলে মাপবে কী দিয়ে?'

'সুখ দিয়ে, বিশেষত দুঃখ দিয়ে।'

গাছ বললে, 'এই পুবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে। কিন্তু, তুমি যে কিসের কথা বললে আমি কিছুই বুঝলেম না।'

আমি বললেম, 'বোঝাই কী করে? তোমার ওই পুবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধরে বীণার তারে যেমনি বেঁধে ফেলেছি, অমনি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আর-এক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয়! এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্মরণাকাশে, তা আমিও ঠিক জানি নে। মনে হয়, যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।'

'আর ওর কাল?'

'ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল। তাই সে কাল সংখ্যার অতীত।'

'দুই আকাশ দুই কালের জীব তুমি, তুমি অদ্ভুত! তোমার ভিতরের কথা কিচ্ছুই বুঝলেম না।'

'নাই বা বুঝলে!'

'আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ?'

'তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বলো তো সে বোঝা, যদি গান বলো তো গান, কল্পনা বলো তো কল্পনা।'

৩

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বললে, 'একটু থামো। তুমি বড়ো বেশি ভাবো আর বড়ো বেশি বকো।'

শুনে আমার মনে হল, 'এ কথা সত্যি।'

আমি বললেম, 'চুপ করবার জন্যেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাসদোষে চুপ করে করেও বকি; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে।'

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মতো আলোকবীণায় দ্রুত তালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠল, 'এই তুমি যা দেখছ আর এই আমি যা ভাবছি, এর মাঝখানের যোগটা কোথায়?'

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললেম, 'আবার তোমার প্রশ্ন? চুপ করো।'

চুপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বললে, 'কেমন, সব বুঝেছ?'

আমি বললেম, 'বুঝেছি।'

৪

সেদিন তো চুপ করেই কাটল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে 'বুঝেছি', কী বুঝেছ বলো তো।'

আমি বললেম, 'নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ওই ঘাসের দিকে, ওই গাছের দিকে।'

'কী রকম দেখলে?'

'দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কী আনন্দ! নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেছে, কত রঙই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত রস! তাই ওই বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম,—ওগো বনস্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদিযুগের সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝল্‌মল্ করছে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল

হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল ; তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেছ, ওরে, আয়-না রে, আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে ; আর আমারই মতো নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়ালা !'

মন আমার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার পরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বললে, 'তুমি ওই প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করে থাকো, আমি যেসব উপকরণ জড়ো করছি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বলো না কেন ?'

'তার কথা আর কইব কী! সে নিজেই নিজের টংকারে ঝংকারে হুংকারে ক্রেংকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বক্ষ ব্যথিত হয়ে উঠল। ভেবে পাই নে এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে ? গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে ? এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ওই গাছের পাতায়।'

'বটে ? কী জবাব শুনি।'

'সে বলছে, প্রাণ যতক্ষণ নেই ততক্ষণ সমস্তই কেবল স্তূপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবা মাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড সুন্দর হয়ে ওঠে। সেই সুন্দরকেই দেখো এই বনবিহারী। তারই বাঁশি তো বাজছে বটের ছায়ায়।'

৫

তখন কবেকার কোন্ ভোররাত্রি।

প্রাণ আপন সুপ্তিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনও তার দেহে ক্লান্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্তুরের সাজে না লেগেছে ধুলো না ধরেছে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অম্লান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ওই বটগাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বললে, 'নমস্কার!'

আমি বললেম, 'রাজপুত্তুর, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চলছে কেমন বলো তো।'

সে বললে, 'বেশ চলছে, একবার চারি দিকে তাকিয়ে দেখো-না।'

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পুবের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়ায়, আমে জামে খেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বললেম, 'রাজপুত্তুর, ধন্য তুমি। তুমি কোমল, তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর। তুমি ছোটো, তোমার তূণ ছোটো, তোমার তীর ছোটো; আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম মোটা, ওর গদা

মস্ত। তবু তো দেখি, দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়্ল, দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ— পাথর মানছে হার, ধুলো দাসখত লিখে দিচ্ছে।'

বট বললে, 'তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে?'

আমি বললেম, 'তোমার লড়াইকে দেখি শান্তির রূপে, তোমার কর্মকে দেখি বিশ্রামের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্তিতে। সেইজন্যেই তো তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেছে ওই সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ওই সহজ অধিকারের সন্ধিটি শেখবার জন্যে। প্রাণ যে কেমন ক'রে কাজ করে অরণ্যে অরণ্যে তারই পাঠশালা খুলেছ। তাই, যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত তারা তোমার বাণী খোঁজে।'

আমার স্তব শুনে বটের ভিতরকার প্রাণপুরুষ বুঝি খুশি হল, সে বলে উঠল, 'আমি বেরিয়েছি মরুদৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে, কিন্তু আমার এক ছোটো ভাই আছে, সে যে কোন্ লড়াইয়ে কোথায় চলে গেল আমি তার আর নাগাল পাই নে। কিছুক্ষণ আগে তারই কথা কি তুমি বলছিলে?'

'হ্যাঁ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি— মন।'

'সে আমার চেয়ে চঞ্চল। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশান্তটার খবর আমাকে দিতে পার?'

আমি বললেম, 'কিছু কিছু পারি বৈকি। তুমি লড়ছ

বাঁচবার জন্যে, সে লড়ছে পাবার জন্যে, আরও দূরে আর একটা লড়াই চলছে ছাড়বার জন্যে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরও একটা লড়াই আছে সঞ্চয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠল, ব্যূহের মধ্যে যে প্রবেশ করছে ব্যূহ থেকে বেরোবার পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। হার জিত অনিশ্চিত ব'লে ধাঁদা লাগল। এই দ্বিধার মধ্যে তোমার ওই সবুজ পতাকা যোদ্ধাদের আশ্বাস দিচ্ছে। বলছে, 'জয়, প্রাণের জয়!' গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ সপ্তক থেকে কোন্ সপ্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই স্বরসংকটের মধ্যে তোমার তম্বুরাটি সরল তারে বলছে, 'ভয় নেই, ভয় নেই!' বলছে, 'এই তো মূল সুর আমি বেঁধে রেখেছি, এই আদি প্রাণের সুর। সকল উন্মত্ত তানই এই সুরে সুন্দরের ধুয়োয় এসে মিলবে, আনন্দের গানে। সকল পাওয়া সকল দেওয়া ফুলের মতো ফুটবে, ফলের মতো ফলবে।' '

ফাল্গুন ১৩২৬

আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'কেউ আসবে বুঝি ?'

মন বলে, 'রোসো! আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরো না।'

চুপচাপ করে আবার খাটতে বসি। ভাবি, জায়গা দখল সারা হবে, জিনিসপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তখন শেষ জবাব মিলবে।

জায়গা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, 'এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।'

মন বলে, 'আরে রোসো, আমার সময় নেই।'

আমি বললেম, 'কেন, আরও জায়গা চাই ? আরও ঘর, আরও সরঞ্জাম ?'

মন বললে, 'চাই বৈকি।'

আমি বললেম, 'এখনও যথেষ্ট হয় নি ?'

মন বললে, 'এতটুকুতে ধরবে কেন ?'

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, 'কী ধরবে ? কাকে ধরবে ?'

মন বললে, 'সে-সব কথা পরে হবে।'

তবু আমি প্রশ্ন করলেম, 'সে বুঝি মস্ত বড়ো?'

মন উত্তর করলে, 'বড়ো বৈকি।'

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠে পড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে, বললে, 'কাজের লোক বটে।'

এক-একবার কেমন আমার সন্দেহ হতে লাগল, বুঝি মন-বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না— সেইজন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজ-সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল-ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু, ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজনদরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, 'আরও না হলে চলবে না।'

'কেন চলবে না?'

'সে যে মস্ত বড়ো!'

'কে মস্ত বড়ো ?'

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি 'অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে' তখন সে রেগে উঠে বলে, 'জবাব দিতেই হবে' এমন কি কথা! যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই; লাঠি-সড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; মিস্ত্রিতে মজুরে ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকিতে কোথাও পা ফেলবার জো কী! সমস্তই স্পষ্ট; এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন!'

শুনে তখন ভাবি, 'মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ।'

আবার ঝুড়িতে করে ইঁট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকি।

২

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতে পাঁচতলা সারা হয়ে ছ'তলার ছাদ পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হল সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর

তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরে পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উতলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ওই বাড়িটার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।'

তারা বলে, 'ছাড়ো, আমার কাজ আছে।'

একটা খ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বললে, 'আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।'

আমি যে কী বুঝলেম জানি নে, বলে উঠলেম, 'তবে আর দেরি নেই।'

সে হেসে বললে, 'না, এল ব'লে।'

তখনি খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বললেম, 'এবার কাজ বন্ধ করো।'

মন বললে, 'সে কী কথা!— লোকে যে বলবে অকর্মণ্য!'

আমি বললেম, 'বলুক গে।'

মন বললে, 'তোমার হল কী! কিছু খবর পেয়েছ নাকি?'

আমি বললেম, 'হাঁ, খবর এসেছে।'

'কী খবর ?'

মুশকিল, স্পষ্ট করে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানসসরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌঁছল।

মন মাথা নেড়ে বললে, 'মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারী সমারোহ ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।'

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝল্‌মল্‌ করে উঠল।

কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, 'দূত এসেছে।'

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেম, 'আসছেন নাকি ?'

চারি দিক থেকে জবাব এল, 'হাঁ, আসছেন।'

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'কী করি !— সবেমাত্র আমার ছয়তলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে ; আর সাজ-সরঞ্জাম সব তো এসে পৌঁছল না !'

উত্তর শোনা গেল, 'আরে, ভাঙো ভাঙো তোমার ছ'তলা বাড়ি ভাঙো।'

মন বললে, 'কেন !'

উত্তর এল, 'আজ আগমনী যে ! তোমার ইমারতটা বুক ফুলিয়ে পথ আটকেছে।'

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শুনি, 'ঝেঁটিয়ে ফেলো তোমার সাজ-সরঞ্জাম।'

মন বললে, 'কেন!'

'তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।'

যাক গে। কাজের দিনে বসে বসে ছ'তলা বাড়ি গাঁথলেম, ছুটির দিনে একে একে সব ক'টা তলা ধূলিসাৎ করতে হল। কাজের দিনে সাজ-সরঞ্জাম হাটে হাটে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারী সমারোহ?

মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কী দেখতে পেলে?

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ওইটুকু?

হাঁ, ওইটুকু। আর দেখতে পেলে শিউলিবনের শিউলি-ফুল।

কেবল ওইটুকু?

হাঁ, ওইটুকু। আর দেখা দিল ল্যাজ দুলিয়ে ভোর-বেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর কী?

আর একটি শিশু, সে খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

‘তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্যে ?’

‘হাঁ, এরই জন্যেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।’

‘এরই জন্যে এত জায়গা চাই ?’

‘হাঁ গো, তোমার রাজার জন্যে সাত-মহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্যে ঘর-ভরা সরঞ্জাম। আর, এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।’

‘আর মস্ত বড়ো ?’

‘মস্ত বড়ো এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।’

‘ওই শিশু তোমাকে কী বর দেবে ?’

‘ওই তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন তূণে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।’

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ‘হাঁ গো কবি, কিছু দেখতে পেলে, কিছু বুঝতে পারলে ?’

আমি বললেম, ‘সেইজন্যেই ছুটি নিয়েছি। এতদিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।’

মহালয়া ১৩২৬

এবার মনে হল, মানুষ অন্যায়ের আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেক দিন থেকে একখানি আসন তৈরি করছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যেদিন উন্মত্ত হয়ে সেই তার অনেক দিনের আসন সে ছিঁড়ে ফেলে সেদিন তার যজ্ঞস্থলীর ভগ্নবেদী বলে, 'কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।'

তখন এত দিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারি দিক থেকে শুনতে পাই, 'জয়, পশুর জয়!'

তখন শুনি, 'আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোখে-ঠুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘানিতে একই আর্তস্বর তুলছে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধের কান্না।'

মন বললে, 'তবে আর কেন? এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।'

শিশুকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে-বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে— যে পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে বুঝেছিলুম, ও পার থেকে রথ বেরোল— সেই পথের দিকে আজ তাকালেম।

মনে হল, সেখানে না আছে আগন্তুকের সাড়া, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, 'দীর্ঘ পথে আমার সুরের সাথি যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।'

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চমকে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেছে।

আমি বলে উঠলুম, 'হায় রে হায়, ওই তো পায়ের চিহ্ন।'

তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে কথা কইছে! তখন দেখি, আকাশে আকাশে প্রতীক্ষা! তখন দেখি, চাঁদের আলোয় তাল গাছের পাতায় পাতায় কাঁপন ধরেছে; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে চাঁদের চোখে চোখে ইশারা!

পথ বললে, 'ভয় নেই!'

আমার বীণা বললে, 'সুর লাগাও!'

বৈশাখ ১৩২৭

স্বর্গ-মর্ত

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারই
আলো দেখবে ব'লে ॥
সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে ॥

সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়
ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,
অমর শিখা আকুল হল
মর্তশিখায় উঠতে জ্বলে ॥

ইন্দ্র। সুরগুরো, একদিন দৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম। তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্যে লড়াই করেছি এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি। সে কথা চিন্তা করে দেখবেন।

বৃহস্পতি। মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। স্বর্গের কী বিপদ আশঙ্কা করছেন?

ইন্দ্র। স্বর্গ নেই।

বৃহস্পতি। নেই! সে কী কথা! তা হলে আমরা আছি কোথায়?

ইন্দ্র। আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, ছায়া হয়ে, লুপ্ত হয়ে গেছে, তা জানতেও পারি নি।

কার্তিকেয়। কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ সমস্ত অনুষ্ঠানই তো চলছে।

ইন্দ্র। অনুষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেছে, দিনশেষে সূর্যাস্তের সমারোহের মতো— তার পশ্চাতে অন্ধকার। তুমি তো জানো, দেবসেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকলপ্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত তার চলে গেছে। দৈত্যেরা যে কত যুগ-যুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না। আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই। মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হ'ত তখনও স্বর্গ ছিল,

কিন্তু যখন থেকে—

কার্তিকেয়। আপনার কথা যেন কিছু-কিছু বুঝতে পারছি।

বৃহস্পতি। স্বপ্ন থেকে জাগবা মাত্রই যেমন বোঝা যায় স্বপ্ন দেখছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্ছে একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তবু এখনও সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি।

কার্তিকেয়। আমার কিরকম বোধ হচ্ছে বলব? তূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি—সমস্তই ঠিক আছে। এমন সময়ে কে যেন বললে, একবার তোমার চারি দিকে তাকিয়ে দেখো। চেয়ে দেখি, শর আছে, কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই। স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে।

বৃহস্পতি। কেন এমন হল তার কারণ তো জানা চাই।

ইন্দ্র। যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল সেই মাটির সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেছে।

বৃহস্পতি। মাটি আপনি কাকে বলছেন?

ইন্দ্র। পৃথিবীকে। মনে তো আছে, একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। তখন স্বর্গমর্ত উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল, তাই সেই যুগকে

সত্যযুগ বলত। সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে ?

কার্তিকেয়। আর, পৃথিবীও যে যায় দেবরাজ ! মানুষ এমনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে যে, সে আপনার শৌর্যকে আর বিশ্বাস করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা। বস্তু নিয়ে মারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে। স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না।

বৃহস্পতি। এখন উদ্ধারের উপায় কী ?

ইন্দ্র। পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে।

বৃহস্পতি। কিন্তু, দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল, সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে। আমি মনে করেছিলুম, ভালোই হয়েছে ; ভেবেছিলুম, এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে, স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ।

ইন্দ্র। একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রেমেই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায়। অমৃতের অভিমানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথচিহ্ন লোপ পেয়েছিল।

কার্তিকেয়। দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা

আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি। তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আসছে; বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই। যুগ যুগ হতে অব্যাঘাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অন্য সমস্ত-কিছু থেকে স্বর্গ বহুদূরে চলে গেছে। স্বর্গ তাই আজ একলা।

ইন্দ্র। উন্নতিই হোক আর দুর্গতিই হোক, যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে তাতেই ব্যর্থতা আনে। ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সুদূরে চলে যায় তখন তার মহত্ত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র। স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলেয়ার আলো হয়ে উঠেছে— লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে, নির্বাপণের শাস্তির চেয়ে তার এই শাস্তি গুরুতর।—দেবলোক আপনাকে অতি বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে; সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মতো মলিন মর্তের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধন মোচন হবে। তার সেই স্বাতন্ত্র্যের বেষ্টন বিদীর্ণ করবার জন্যেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না— বৃহস্পতি, মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে অজ্ঞানীর সঙ্গে,

দুঃখীর সঙ্গে, তাকে মিলিয়ে দিতে হবে।

বৃহস্পতি। তা হলে আপনি কী করতে চান?

ইন্দ্র। আমি পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই তো দুঃখ।

ইন্দ্র। দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব। নক্ষত্র যেমন খ'সে পড়ে, তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি করে পৃথিবীতে যাব।

বৃহস্পতি। আপনার জন্মাবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায়?

কার্তিকেয়। বৈশ্য এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈশ্যের সেবায় লড়াই করছে, ব্রাহ্মণ এখন বৈশ্যের দাস।

ইন্দ্র। কোথায় জন্মাব সে তো আমার ইচ্ছার উপরে নেই—যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে সেইখানেই আমার স্থান হবে।

বৃহস্পতি। আপনি যে ইন্দ্র সেই স্মৃতি কেমন করে—

ইন্দ্র। সেই স্মৃতি লোপ করে দিয়ে তবেই আমি মর্তবাসী হয়ে মর্তের সাধনা করতে পারব।

কার্তিকেয়। এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম,

আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেই তন্বী শ্যামা ধরণী সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কী উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে! সেই ভীরুর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কী আনন্দ! সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কী গৌরব! সেই চন্দ্রকান্তমণিকিরীটিনী নীলাম্বরী সুন্দরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে যে, সে রানী! তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা।

ইন্দ্র। আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণসমীরণে এই কথাটি রেখে আসতে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত ম্লান—তাকে বেষ্টন করে ধ'রে যে সমুদ্র রয়েছে সেই তো স্বর্গের অশ্রু, তারই বিচ্ছেদক্রন্দনকেই তো সে মর্তে অনন্ত করে রেখেছে।

কার্তিকেয়। দেবরাজ, যদি অনুমতি করেন তা হলে আমরাও পৃথিবীতে যাই।

বৃহস্পতি। সেখানে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি।

কার্তিকেয়। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেছেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব? আমি যে বুঝতে পারছি, আমাকে

পৃথিবীর দরকার আছে; আমি নেই বলেই তো সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্যে নির্লজ্জ হয়ে যুদ্ধ করছে, ধর্মের জন্যে নয়।

বৃহস্পতি। আর, আমি নেই বলেই তো মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্যে জ্ঞানের সাধনা করছে, মুক্তির জন্যে নয়।

ইন্দ্র। তোমরা সেখানে যাবে, আমি তো তারই উপায় করতে চলেছি—সময় হলেই তোমরা পরিণত ফলের মতো আপন মাধুর্যভারে সহজেই মর্তে স্খলিত হয়ে পড়বে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

কার্তিকেয়। কখন টের পাব, মহেন্দ্র, যে আপনার সাধনা সার্থক হল?

বৃহস্পতি। সে কি আর চাপা থাকবে? যখন জয়-শঙ্খধ্বনিতে স্বর্গলোক কেঁপে উঠবে তখনই বুঝব যে—

ইন্দ্র। না, দেবগুরু, জয়ধ্বনি উঠবে না। স্বর্গের চোখে যখন করুণার অশ্রু গ'লে পড়বে তখনই জানবেন, পৃথিবীতে আমার জন্মলাভ সফল হল।

কার্তিকেয়। ততদিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন।

বৃহস্পতি। পৃথিবীর রসই তো হল এই লুকো-চুরিতে। ঐশ্বর্য সেখানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য সেখানে পরা-

ভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে। সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে। যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয়; যা না দেখা দেয় তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে।

কার্তিকেয়। কিন্তু, সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হল কেন?

বৃহস্পতি। মর্তে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক।

ইন্দ্র। দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এখনই আমাকে পীড়িত করছে। আজ আমি দুঃখেরই অভিসারে চলেছি; তারই আহ্বানে আমার মনকে টেনেছে। শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে; সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এতদিন পরে আজ আমার মনে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। আমি চললুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে। প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব। আমাকে বিদায় দাও।

কার্তিকেয়। মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব। স্বর্গ আজ দুঃখের অভিযানে বাহির হোক।

বৃহস্পতি। আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম দেবরাজ। স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে

আমাদের মুক্তি নেই।

কার্তিকেয়। বাহির করো, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির করো—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা করো।

বৃহস্পতি। তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ করে জানিয়ে দাও যে, স্বর্গ পৃথিবীরই।

কার্তিকেয়। যারা স্বর্গকামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেছে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ—আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে।

ইন্দ্র। সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিতে যাবার পথ—

বৃহস্পতি। যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে।

গান

পথিক হে, পথিক হে,
ওই যে চলে, ওই যে চলে,
সঙ্গী তোমার দলে দলে ॥
অন্য মনে থাকি কোণে,
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে

পায়ের ধ্বনি আকাশতলে ॥

পথিক হে, পথিক হে,
যেতে যেতে পথের থেকে,
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে
এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই
তোমার চলা হৃদয়তলে ॥

ফাল্গুন ১৩২৫

লিপিকার সমুদায় রচনা ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। গ্রন্থের ভিতরে প্রত্যেক রচনার শেষে সেই প্রকাশকাল নির্দেশ করা হইয়াছে এবং নিম্নের সূচীতে এ বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া গেল। অনেকগুলি রচনার সাময়িকে মুদ্রিত শিরোনাম গ্রন্থভুক্ত নাম হইতে পৃথক; সেগুলি '॥' চিহ্নের পর নির্দেশ করা গেল। সর্বশেষ কথিকাটি (পৃ ১৭২-৭৩) ১৩৫২ সংস্করণের নূতন সংকলন; ১৩২৭ বৈশাখের ভারতী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত।—

তোতা-কাহিনী	সবুজ পত্র	১৩২৪ মাঘ
স্বর্গ-মর্ত	সবুজ পত্র	১৩২৫ ফাল্গুন
ঘোড়া ॥ মুক্তির ইতিহাস	সবুজ পত্র	১৩২৬ বৈশাখ
প্রথম শোক ॥ কথিকা	সবুজ পত্র	১৩২৬ আষাঢ়
কর্তার ভূত	প্রবাসী	১৩২৬ শ্রাবণ
অস্পষ্ট ॥ কথিকা	সবুজ পত্র	১৩২৬ শ্রাবণ
বাণী ॥ কথিকা	সবুজ পত্র	১৩২৬ ভাদ্র
পায়ে চলার পথ	প্রবাসী	১৩২৬ আশ্বিন
প্রশ্ন	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
মেঘলা দিনে ॥ অক্ষমতা	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
পুরোনো বাড়ি	মানসী ও মর্ম্মবাণী	১৩২৬ আশ্বিন
আগমনী	আগমনী	১৩২৬ মহালয়া
মেঘদূত	প্রবাসী	১৩২৬ কার্তিক
বাঁশি	সবুজ পত্র	১৩২৬ কার্তিক
কৃতঘ্ন শোক	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক

সতেরো বছর	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সন্ধ্যা ও প্রভাত	মানসী ও মর্ম্মবাণী	১৩২৬ কার্তিক
একটি চাউনি	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
একটি দিন	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
গলি ॥ কথিকা	সবুজ পত্র	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
সওগাত	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
মুক্তি	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
প্রাণমন ॥ আমার কথা	সবুজ পত্র	১৩২৬ ফাল্গুন
গল্প ॥ গল্প বল	প্রবাসী	১৩২৭ বৈশাখ
রথযাত্রা	আঙুর	১৩২৭ বৈশাখ
কথিকা	ভারতী	১৩২৭ বৈশাখ
সুয়োরানীর সাধ	পার্বণী	১৩২৭ আশ্বিন
নতুন পুতুল	প্রবাসী	১৩২৮ ভাদ্র
নামের খেলা	মোসলেম ভারত	১৩২৮ ভাদ্র
পট	সবুজ পত্র	১৩২৮ ভাদ্র
রাজপুত্তুর	ভারতী	১৩২৮ আশ্বিন
ভুল স্বর্গ	প্রবাসী	১৩২৮ কার্তিক
মীনু	ভারতী	১৩২৮ কার্তিক
সিদ্ধি	সবুজ পত্র	১৩২৮ মাঘ-ফাল্গুন
বিদূষক	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
উপসংহার	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
পরীর পরিচয়	বঙ্গবাণী	১৩২৯ বৈশাখ
প্রথম চিঠি	শান্তিনিকেতন	১৩২৯ বৈশাখ
পুনরাবৃত্তি	প্রবাসী	১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের অন্য বহু রচনায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি সাময়িকের ও পুস্তকের পাঠে বহু স্থলে মিল নাই। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, 'মেঘলা দিনে' ও 'প্রাণমন' লিপিকায় পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে 'মুক্তি' কথিকাটির লিপিকায় গৃহীত পাঠ পূর্বপ্রকাশিত পাঠের তুলনায় সংস্কৃত ও সংক্ষিপ্ত।

লিপিকার প্রথম ভাগের কতকগুলি লেখায় ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৯২ বৈশাখ) 'পুষ্পাঞ্জলি'র কোনো কোনো স্তবকের প্রভাব দেখা যায়; পুষ্পাঞ্জলির সূচনাংশ ('প্রভাতে') লিপিকার 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কথিকার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই রূপান্তরের প্রকৃতি বুঝা যাইবে। উভয় রচনার মধ্যে প্রায় চৌত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। সমুদয় পুষ্পাঞ্জলি সপ্তদশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে সন্নিবিষ্ট আছে।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'লিপিকা'য় প্রথম তিনি বাংলা গদ্যকবিতা লিখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।' লিপিকার প্রথম ভাগের অধিকাংশ রচনাই উক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। লিপিকার প্রথম-মুদ্রণ-কালে ওইরূপ রচনায় বাক্যের মাঝে মাঝে ছন্দের বিরাম-স্থলগুলিতে বেশি ফাঁক দেখানো হইয়াছিল। কবিতার মতো বাক্যকে আবৃত্তির ছন্দ অনুযায়ী ভাঙিয়া সাজানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৩২৬ আশ্বিনের ভারতীতে। এই স্থলে উহা যথাযথ উদ্‌ধৃত করা গেল।—

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি—গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,—একলা গলির উপরকার জান্‌লার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপনি জানেনা।

সকালের রৌদ্র সাম্‌নের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে;

কাঁচা-আমওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে "মা কোথায়?"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুম্‌রে উঠ্‌চে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিটমিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড় টিক্‌টিকি।

সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্‌ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে।

উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা?"

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই;

কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।